অধ্যায় - ৫০

১) কাকাসাহেব দীক্ষিত ২) শ্রী টেম্বে স্বামী ৩) বালারাম ধুরন্ধরের কাহিনী।

মূল মারাঠি 'সৎচরিত্র' গ্রন্থের ৫০ তম অধ্যায়টির একই বিষয় বলে এই গ্রন্থে ৩৯ তম অধ্যায়ের সঙ্গে এক সাথে জোড়া হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থের ৫১ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে ৫০ তম অধ্যায়ের রূপে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

সাই মহারাজের জয় হোক, যিনি ভক্তদের অবলম্বন ও সর্বশক্তি দাতা। তিনি গীতাধর্মের উপদেশ দিয়ে আমাদের শক্তি প্রদান করছেন। হে সাই, কৃপাদৃষ্টিসহ আমাদের আশীষ দাও। যেমন মলয় পর্বতের চন্দন বৃক্ষ সব তাপ হরণ করে নেয় অথবা যেভাবে মেঘ জলবৃষ্টি করে লোকেদের শীতলতা ও আনন্দ প্রদান করে বা যেমন বসন্তে ফোটা ফুল ঈশ্বরের পূজোর কাজে লাগে, সেই রকমই শ্রী সাইবাবার লীলা কাহিনীগুলি পাঠক ও শ্রোতাদের ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা প্রদান করে। যারা এই লীলাগান করে বা শোনে তারা দুজনেই ধন্য। কারণ, বলায় মুখ ও শোনায় কান পবিত্র হয়ে যায়।

এটা তো সবাই স্বীকার করবে যে, শত রকমের সাধনা করা সত্ত্বেও সদগুরুর কৃপা না হলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনুন -

কাকাসাহেব দীক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬) ঃ-

শ্রী হরি সীতারাম ওরফে কাকাসাহেব দীক্ষিত ১৮৬৪ সালে খাণ্ডোয়াতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ওঁর প্রাথমিক শিক্ষা খাণ্ডোয়া ও হিঙ্গন ঘাটে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা নাগপুরে উচ্চ শ্রেণীতে প্রাপ্ত করার পর উনি প্রথমে বিল্‌সন ও পরে এল্‌ফিন্সটন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে L.L.B ও Solicitor

য়ের পরীক্ষা পাশ করে সরকারী Solicitor ফার্ম-মেসার্স লিটিল এ্যাণ্ড কোম্পানীতে কাজ করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর উনি নিজের একটা সলিসিটর ফার্ম খোলেন।

১৯০৯ সালের আগে বাবার কথা উনি কখনো শোনেননি। কিন্তু এরপর উনি খুব শীঘ্রই বাবার পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। লোনাওয়ালায় থাকাকালীন ওঁর এক পুরোন বন্ধু শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে হঠাৎ দেখা হয়। দুজনে এদিক ওদিককার আলোচনায় সময় কাটাতেন। কাকাসাহেব ওঁকে জানান যে, যখন উনি লন্ডনে ছিলেন সেই সময় একবার ট্রেনে চড়তে গিয়ে উনি পা ফস্‌কে পড়ে যান। তাতে পায়ে খুব আঘাত পান। ঘটনার বিবরণটি শুনে নানাসাহেব ওঁকে বলেন- "যদি তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে আমার সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার শরণে যাও।" উনি বাবার পুরো ঠিকানা দিয়ে তাঁর কথার পুণরাবৃত্তি করেন- **"আমি নিজের ভক্তকে সাত সমুদ্র পার থেকেও এমন ভাবে টেনে আনব যেমন সূতোয় বাঁধা পাখীকে টেনে নিজের কাছে আনা হয়।"** উনি এও স্পষ্ট করে দেন- "তুমি যদি বাবার আপন জন না হও, তাহলে তোমার তাঁর প্রতি আকর্ষণই জাগবে না এবং তাঁর দর্শনও পাবে না।" কাকাসাহেব এই কথা শুনে খুব খুশী হন এবং বলেন যে, শিরডী গিয়ে বাবার কাছে শারীরিক পঙ্গুতার বদলে ওঁর চঞ্চল মনকে পঙ্গু করে পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থণা করবেন। কিছুদিন পরই বম্বে বিধান সভার (Legislative Assembly) নির্বাচনে ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কাকাসাহেব দীক্ষিত আহমদনগর যান এবং প্রত্যেকবারের ন্যায় মিরীকরের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর- কোপর গ্রামের মাম্‌লৎদার কাকাসাহেব মিরীকরের সুপুত্র- সেই সময় অশ্ব প্রদর্শনী দেখার জন্য আহমদনগর এসেছিলেন। এদিকে পিতা-পুত্র দুজনেই চিন্তা করছিলেন যে, কাকাসাহেবের সঙ্গে কাকে শিরডী পাঠানো যেতে পারে আর ওদিকে বাবা অন্য আর এক ভাবে ওঁকে নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা করছিলেন। শামার কাছে টেলিগ্রাম আসে যে, ওঁর শাশুড়ীর অবস্থা খুব শোচনীয় এবং উনি যেন শীঘ্র আহমদনগর আসেন। বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে শামা ওখানে গিয়ে নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রদর্শনীতে যাওয়ার সময় নানাসাহেব পানসে ও আপ্পা গরদের দৃষ্টি হঠাৎ শামার উপর পড়ে। ওঁরা শামাকে মিরীকরের বাড়ী গিয়ে কাকাসাহেব দীক্ষিতের সাথে দেখা করতে এবং ওঁকে নিজের সঙ্গে শিরডী নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শামার আগমনের খবর দীক্ষিত ও মিরীকরকেও দিয়ে দেন। মিরীকর শামার সাথে কাকাসাহেবের পরিচয় করিয়ে দেন এবং এরপর এই স্থির হয় যে, কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামা রাত দশটার গাড়ীতে

কোপর গ্রাম রওনা হবেন। এই ব্যবস্থার ঠিক পরেই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। বালাসাহেব মিরীকর বাবার একটা বড় ছবির উপর থেকে কাপড় সরিয়ে কাকাসাহেবকে তাঁর দর্শন করান। এই দেখে কাকাসাহেব খুব আশ্চর্য্য হন এবং ভাবেন- "যাঁর দর্শনের জন্য আমি শিরডী যাচ্ছি, তিনি এই ছবির রূপে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এখানেই বিরাজমান।" স্তব্ধ হয়ে উনি বাবার বন্দনা করেন। এই ছবিটি ছিল মেঘার এবং কাঁচ লাগানোর জন্য মিরীকরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কাঁচ লাগিয়ে সেটি কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামার হাতে শিরডী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। দশটার আগেই স্টেশনে পৌঁছে ওঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনেন। গাড়ী স্টেশনে এসে পৌঁছলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিল ধারণের স্থান নেই- এত ভীড়। সৌভাগ্যক্রমে গার্ড সাহেব কাকাসাহেবকে চিনতেন এবং উনি এই দুজনকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে দেন। এই ভাবে আরামে যাত্রা করে ওঁরা কোপরগ্রাম স্টেশনে নামেন। স্টেশনেই, শিরডীর জন্য রওনা হতে প্রস্তুত শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরকে দেখে ওঁরা অত্যন্ত খুশী হন। শিরডী পৌঁছে মস্‌জিদে গিয়ে ওঁরা বাবাকে দর্শন করেন। তখন বাবা বলেন- "আমি অনেকদিন থেকেই তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম। আমিই শামাকে তোমায় আনতে পাঠাই।" এরপর কাকাসাহেব অনেক বছর বাবার সঙ্গে কাটান। উনি শিরডীতে একটা 'ওয়াড়া' (দীক্ষিত ওয়াড়া) তৈরী করান, যেটি প্রায় ওঁর স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি বাবার কাছে যা অনুভূতি প্রাপ্ত করেন, সেগুলি এখানে স্থানাভাবে দেওয়া হচ্ছে না। পাঠকদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা শ্রী সাই লীলা পত্রিকার বিশেষাংক (কাকাসাহেব দীক্ষিত) ভাগ ১২ -র ৬-৭ অঙ্ক নিশ্চয়ই পড়বেন। শুধু একটি তথ্য লিখে আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করব। বাবা ওঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শেষ সময় বাবা ওঁকে বিমানে নিয়ে যাবেন। এ কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়- ৫ই জুলাই (১৯২৬ সাল) কাকাসাহেব হেমাডপন্তের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছিলেন। উনি বাবার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ ওঁর ঘাড়টা হেমানপন্তের কাঁধের ওপর ঢলে পড়ে। কোনরকম কষ্ট বা যন্ত্রণা ভোগ না করেই উনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রী টেম্বে স্বামী ঃ-

সন্তরা পরস্পরকে কি ভাবে ভাই-য়ের মত প্রেম করেন, এই কথাটাই এই দ্বিতীয় কাহিনীটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে। একবার শ্রী বাসু দেবানন্দ সরস্বতী, যিনি শ্রীটেম্বে স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন, গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রীতে এসে শিবির গড়লেন। তিনি ভগবান দত্তাত্রয়ের কর্মকাণ্ডী, জ্ঞানী ও যোগী ভক্ত ছিলেন। নাঁদেড়ের (নিজাম

স্টেট) এক উকিল নিজের বন্ধুদের সাথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং কথাবার্তার মাঝে শ্রী সাইবাবার কথা ওঠে। বাবার নাম শুনে স্বামীজী তাঁকে করবদ্ধ প্রণাম করেন এবং পুন্ডলীকরাওকে (উকিল) একটা শ্রীফল দিয়ে বলেন- "তুমি গিয়ে আমার ভাই শ্রীসাইকে প্রণাম করে বোল তিনি আমায় যেন না ভোলেন এবং সদৈব আমার উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখেন।" তিনি এও বলেন যে সাধারণতঃ একজন সাধু অন্যজনকে প্রণাম করেন না- কিন্তু এখানে বিশেষ রূপে এরকম করা হল। শ্রী পুন্ডলীক রাও শ্রীফলটি নিয়ে বলেন- "আমি এটি বাবাকে অবশ্যই দেব ও আপনার বার্তা পৌঁছে দেব।"

এক মাস পরই পুন্ডলীকরাও অন্য বন্ধুদের সাথে শ্রীফল নিয়ে শিরডী রওনা হন। মনমাড পৌঁছে জল খেতে যান। খালি পেটে জল খাওয়া উচিত নয় ভেবে একটু চিড়ে মুখে দেন। কিন্তু সেটা বিস্বাদ লাগায় একজন একটি নারকেল ভেঙ্গে সেটা চিড়েতে মিশিয়ে দেয়। এই ভাবে চিড়েগুলি সুস্বাদু করে সবাই মিলে খায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে দেখা গেল যে পুণ্ডলীক রাওকে শ্রীটেম্বে স্বামী যে নারকেলটি বাবাকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন সেটিই ভেঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। শিরডী পৌঁছে ওঁরা ভয়ে-ভয়ে বাবার দর্শন করতে যান। এদিকে বাবা তো স্বামীজীর কাছ থেকে নারকেলের বিষয়ে বার্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই পুন্ডলীকরাওকে বলেন- "আমার ভাইয়ের পাঠানো বস্তুটি আনো।" উনি বাবার পা ধরে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন ও নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তার পরিবর্তে উনি অন্য নারকেল দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা আপত্তি জানালেন এই বলে- "ঐ নারকেলটির মূল্য এই নারকেলের চেয়ে অনেক বেশী এবং তার ক্ষতিপূরণ সাধারণ নারকেল দিয়ে হতে পারে না। তবে আর চিন্তা করার কিছু নেই। আমারই ইচ্ছায় তোমায় ঐ নারকেলটি দেওয়া হয় এবং পরে আমার ইচ্ছাতেই পথে সেটি ভাঙ্গা হয়। তুমি নিজের ঘাড়ে কর্তা ভাব ("আমি করছি"- এই ভাব) আনছ কেন?[১] যে কোন বড় (ভালো) বা ছোট (মন্দ) কাজ করার সময় নিজেকে কর্তা না মনে করে, অভিমান ও অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে কাজটি করলে তোমার দ্রুত উন্নতি হবে।"[২] কত সুন্দর ছিল তাঁর এই অধ্যাত্মিক উপদেশ।

শ্রী বালারাম ধুরন্ধর (১৮৭৮-১৯১০) ঃ-

সান্তাক্রুজ, বম্বের শ্রী বালারাম ধুরন্ধর 'পাথারে প্রভু' সম্প্রদায়ের এক সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। উনি বম্বের উচ্চ ন্যায়ালয়ে অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন এবং কোন এক সময়

Government Law School য়ের (Bombay) প্রধানাচার্য্যও ছিলেন। পরিবারে সবাই সাত্বিক ও ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিলেন। উনি একটি বইও লিখেছিলেন। এরপর ওঁর মন আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়। মন দিয়ে গীতা, তার টীকা জ্ঞানেশ্বরী এবং অন্য দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উনি পন্ঢরপুরের ভগবান বিঠোবার পরম ভক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে উনি শ্রী সাইবাবার দর্শনের সুযোগ পান। ছ' মাস আগে ওঁর ভাই বাবুলজী ও বামনরাও শিরডী এসে বাবার দর্শন করেছিলেন এবং বাড়ী ফিরে নিজেদের মধুর অনুভূতি শ্রী বালারাম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শুনিয়েছিলেন। তখন সবাই মিলে শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করা স্থির করেন। এইদিকে শিরডীতে ওঁদের পৌঁছবার আগেই বাবা স্পষ্ট শব্দে বলেন- "আজ আমার দরবারের কয়েকটি লোক আসছে।" পরে বাবার এই সুস্পষ্ট উক্তির কথা অন্যদের কাছে শুনে ধুরন্ধর পরিবার মহান আশ্চর্যান্বিত হন- ওঁরা নিজেদের শিরডী যাত্রার খবর কাউকেই দেননি। সবাই এসে বাবাকে প্রণাম করে কথাবার্তা শুরু করেন। বাবা উপস্থিত লোকেদের বলেন- "এরাই আমার দরবারের সেই লোক যাদের বিষয় তোমাদের আগে বলেছিলাম।" তারপর ধুরন্ধর ভাইদের লক্ষ্য করে বলেন- "আমার সাথে তোমাদের পরিচয় ৬০ জন্ম পুরোন।" ওঁদের সবার স্বভাব ভদ্র ও নম্র ছিল। তাই ওঁরা হাত জোড় করে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবাকেই দেখছিলেন। ওঁদের মধ্যে সব প্রকারের সাত্বিক ভাব যেমন অশ্রুপাত্, রোমাঞ্চ, কন্ঠরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। সবাই খুবই আনন্দিত হন। এরপর ওঁরা খাবার খেতে যান। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার মস্‌জিদে এসে বাবার পা টিপতে শুরু করেন। এই সময় বাবা ছিলিম (কলকে) পান করছিলেন। তিনি বালাসাহেবকে ছিলিমটি দিয়ে একটা টান দিতে বলেন। যদিও আজ পর্যন্ত উনি কখনো ধূমপান করেননি তবুও ছিলিম হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে বালারাম একটা টান দেন। তারপর সশ্রদ্ধ ভাবে সেটি বাবাকে ফিরিয়ে দেন। উনি ছ' বছর থেকে হাঁপানিতে ভুগছিলেন। কিন্তু ছিলিমে টান দিতেই রোগমুক্ত হয়ে যান। ছ' বছর পর আরেকবার একটি বিশেষ দিনে সেই কষ্ট দেখা দেয়। সেটি ছিল বাবার মহাসমাধির দিন। বালারাম বৃহস্পতিবারে শিরডী এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 'চাওড়ী' উৎসব দেখার সুযোগ পান। 'চাওড়ী'তে আরতির সময় বালারামের বাবার মুখ-মন্ডল ভগবান পাণ্ডুরঙ্গের ন্যায় মনে হয়। পরের দিন ভোর বেলা কাকড় আরতির সময় বালারাম নিজের পরম ইষ্টদেব পান্ডুরঙ্গের জ্যোতি বাবার মুখে আবার দেখতে পান।

শ্রীবালারাম ধুরন্ধর মারাঠীতে মহারাষ্ট্রের মহান সন্ত তুকারামের জীবন চরিত্র

লিখেছেন। কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন না। ওঁর ভাইরা এই পুস্তকটি ১৯২৮ সালে প্রকাশ করেন। পুস্তকটির ভূমিকায় বালারামের জীবন-বৃত্তান্তে ওঁর শিরডী-যাত্রার এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। গীতা ৩/২৭

২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। গীতা ৩/১৯